International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XI, Issue-V, September 2025, Page No. 24-34
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.11.issue.05W.127

ঝাড়গ্রাম জেলার লৌকিক উৎসব করম পরব-প্রকৃতি ও বৃক্ষপূজার অনন্য নিদর্শন

শ্রীমতি সরজু পাল
গবেষক, সোনা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঘাটশিলা, জামশেদপুর, ঝাড়খন্ড, ভারত

Received: 13.09.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Jhargram is one of the most diverse districts of West Bengal, India. Dense forests surrounded by greenery and small and big hills, rivers, waterfalls have made the natural beauty here pleasant and visually appealing. The pristine beauty of Jhargram district, surrounded by saal, mahua and palash, is a matter of pride and admiration for the people of West Bengal and the whole of India. Most of the people living in Jhargram district speak Bengali, but many people aalso speak Santal, Kurmali, Mundari and other languages. So, their religious rituals are different. The caste Hindu community worships mythological deities while the indigenous people worship folk and village deities. Being a border area between the states of Odisha and Jharkhand, it has a mixed culture. The indigenous and tribal people here have their own festivals, songs and dances which are very rich and colourful. Karam Parab, the worship of Nature and Trees, is one of the most attractive folk festivals of Jhargram. It's a harvest-centric or creation festival dedicated to the deity Karam. Young people belonging to various tribal and agrarian communities celebrate this Karam festival in different rituals on Shukla Ekadashi Tithi of Bhadra month through Karam song and dance and pray to nature for good harvest and prosperity. Through the various regional dances and songs performed during this festival, aspects of love for nature, brotherly love, and the suffering, hardship and deprivation of rural women are vividly revealed.

Keyword: Karam Parab, Briksho puja, Jhargram, Bhadra mas, Jawa gaan.

ভূমিকা:

মহাবিশ্বে সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেই সবকিছু সৃষ্টি করেছে। আমাদের পরিচিত উপাদানগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে জল, মাটি, বাতাস, আলো, পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, সাগর- ইত্যাদি জড় উপাদান আবার তেমনই রয়েছে গাছপালা, জীবজন্তু, পশুপাখি, মানুষ- ইত্যাদি সজীব উপাদান। প্রকৃতির সৃষ্টি সকল উপাদানই একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যা একটি সুসংহত বাস্তুতন্ত্র গঠনে সহায়তা করে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই আদিম মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অরণ্যকেন্দ্রিক। তাদের জীবন ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তাই তারা ছিল প্রকৃতি প্রেমিক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। বিশেষকরে শহরের বাসিন্দা সত্যচরণ ও অরণ্যবাসী সাধারণ মানুষের প্রকৃতির প্রতি ঘনিষ্ঠতা বোঝাতে গিয়ে কথক বলেছেন (পৃষ্ঠা-২৩), "গনু জীবনকে দেখিয়াছে অন্যভাবে। অরণ্য-প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আজীবন কাটাইয়া সে অরণ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন রীতিমত বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তি"। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে বিভিন্ন কারণে পবিত্র ও আরাধনার পাত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ব্যাপারে লেখক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস'-আদি পর্বে (পৃষ্ঠা-৬১০) বলেছেন, "ভারতীয় আদিবাসীরা অন্যান্য দেশের অনেক আদিবাসীদের মতো, বিশেষ বৃক্ষ, পাথর,

পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুন্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশ, বুনো, শবর ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে, গাছপূজা এখনও বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বট গাছ। অনেক পূজায় ব্রতোৎসবে গাছের একটা ডাল আনিয়া পুতিয়া দেওয়া হয়, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মস্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়"। তাই গাছ যে প্রকৃতির একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান তা বিভিন্ন লেখকের লেখনিতেও ফুটে উঠেছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য জনজাতির মানুষজন বিভিন্ন রীতি ও উপাচারে গাছকে জীবনের উৎস ও পবিত্র মনে করে পূজা করে। আবার ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে আদিবাসী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন শাল, বেল, অশ্বত্থ, অশোক, করম ইত্যাদি গাছকেও পবিত্র মনে করে ও দেবতাজ্ঞানে পূজা করে।

আমি আমার প্রবন্ধটিতে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত একটি অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উৎসবের বিষয়ে আলোকপাত করব, তা হল করম পরব যা কেবল ঝাড়গ্রাম নয়, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, মালদহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তথা ঝাড়খন্ড, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, আসাম, বাংলাদেশেও ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে পালিত হয়, যেখানে একটি করম গাছের ডাল কেটে মাটিতে প্রোথিত করা হয় এবং তার উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করা হয়।

করম পরবের বিবরণ: ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন গ্রামে সাঁওতাল, মুন্ডা, লোধা, শবর, কোড়া, বিরহোড়, ভূমিজ ইত্যাদি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি কুড়মি, মাঝি, বাগাল, মাহালি, কুমার বা কুম্ভকার, কামার ইত্যাদি অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন যারা এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র, তারাও এই কৃষিকেন্দ্রিক এবং বৃক্ষ-পূজার উৎসবটি ভক্তি ও উদ্দীপনার সঙ্গে নিজস্ব রীতিতে উদ্‌যাপন করে। এ বছর (১৪৩২ বঙ্গাব্দ) ভাদ্র মাসের ১৭ তারিখ (ইংরেজী-৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রীষ্টাব্দ), পার্শ্ব বা শুক্লা একাদশী তিথিতে সাড়ম্বরে করম পরব পালন করা হয়। এটি মূলত আদিবাসীদের উৎসব হিসেবে প্রচলিত থাকলেও ঝাড়গ্রাম তথা সমগ্র জঙ্গলমহলের কুড়মি মম্প্রদায়ের মানুষজনই করম পরব পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এবছরও তার ব্যাতিক্রম ঘটে নি। ডঃ মধুপ দে রচিত 'ঝাড়গ্রাম-ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থ (পৃষ্ঠা-২২৮) থেকে জানা যায়, কোনো উচ্চবর্ণযুক্ত মানুষের ঘরে প্রাকৃতিক কারণে যদি সেদ্ধ করা ধানে অঙ্কুর বের হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই করম ঠাকুরের পূজা করতে হয়। এই ক্ষেত্রে তাঁকে পূজার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হয় এবং প্রতিবেশী আদিম জনজাতির দ্বারা এই পূজা সম্পন্ন করতে হয়। অর্থাৎ কারও ঘরে কোনো কারণে সেদ্ধ ধান অঙ্কুরিত হলেই তাকে করম-পূজা করতে হয় এবং এই বিশ্বাস প্রাচীন কাল থেকেই আদিবাসী ও অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছে।

করম পরবের একটি উল্লেখযোগ্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হল 'জাওয়া পরব'। এই জাওয়া পরবের পরিসমাপ্তি ঘটে করম পূজার মধ্যে। জাওয়া পরব হল করম পরবের প্রস্তুতিমূলক অংশ এবং করম পরব হল মূল উৎসবটির পূর্ণাঙ্গ রূপ। অর্থাৎ এই দুটি উৎসব একে অপরের পরিপূরক। 'জাওয়া' শব্দের অর্থ 'জন্মানো' বা 'অঙ্কুরিত হওয়া'। এই পরব ভাদ্র মাসে নতুন শস্য রোপণের সময় শুরু হয়, যা শুক্লা একাদশী তিথির পাঁচ, সাত, নয় বা এগারো- ইত্যাদি বিজোড় সংখ্যার দিন থেকে শুরু হয়। গ্রামের আদিবাসী ও অ-আদিবাসী কুমারী মেয়েরা সূর্যোদয়ের পুর্বে পাশাপাশি নদী, পুকুর বা খালে স্নান সেরে বাঁশের তৈরী ঝুড়ি বা টুপাগুলিতে বালি ভর্ত্তি করে। এরপর দ্রুত অঙ্কুরিত হয় সেইরূপ পাঁচ বা সাত রকমের শস্যবীজ যেমন- ধান, ছোলা, মটর, সরিষা, 'জনহার' বা 'ভুট্টা', মুগ, বিরি ইত্যাদি ঐ বালি ভর্ত্তি টুপাগুলির উপর বীজ বোনার মত ছড়িয়ে দেয় এবং নিয়মিত হলুদ জল সিঞ্চন করে। একে 'জাওয়া পাতা' বলে এবং শস্যবীজ সহ এই টুপাগুলিকে বলে 'জাওয়া-ডালি' এবং এই ডালিগুলো একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে করম বেদীতে কাঠের পিড়ির উপর গোলাকারে সাজিয়ে রাখে। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় স্নানের পর কুমারী মেয়েরা তাদের জাওয়া-ডালিগুলোকে বেদীর চারপাশে রেখে একে অপরের হাত ধরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে গোল গোল ঘুরতে ঘুরতে সুরেলী কণ্ঠে গান করে। এই গানগুলোকে 'জাওয়া গান' বলে। আবার মা যেমন তার সন্তানদের নিয়মিত পরিচর্যা করে বড় করে তোলে, তেমনই এই কুমারী মেয়েরাও এই শস্যবীজগুলির উপর নিয়মিত হলুদ জল সিঞ্চন করে যাতে বীজগুলিকে পোকাতে নষ্ট না করে এবং দ্রুত বেড়ে ওঠে। তাই তাদের

'জাওয়া-মা' বলা হয়। তাদের গাওয়া এই আঞ্চলিক গানগুলি থেকে প্রকৃতি-প্রেম, ভাতৃপ্রেম, নারীর দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের দিকগুলি ফুটে ওঠে। যেমন –

(১)
'অতি অতি জায়অ, কিয়া কিয়া জায়অ
জায়অ লো মা, 'ধান' কা বেহুলা।
পাতায় তো শিগির্ মিগির্
করে বেহুলা'।

(২)
'অতি অতি জায়অ, কিয়া কিয়া জায়অ
জায়অ লো মা, 'মুগ' কা বেহুলা।
পাতায় তো শিগির্ মিগির্
করে বেহুলা'।

(৩)
'অতি অতি জায়অ, কিয়া কিয়া জায়আ
জায়অ লো মা, 'ছোলা' কা বেহুলা।
পাতায় তো শিগির্ মিগির্
করে বেহুলা'।

(৪)
'অতি অতি জায়অ, কিয়া কিয়া জায়অ
জায়অ লো মা, 'মটর' কা বেহুলা।
পাতায় তো শিগির্ মিগির্
করে বেহুলা'।

(৫)
'অতি অতি জায়অ, কিয়া কিয়া জায়অ
জায়অ লো মা, 'জনহার' কা বেহুলা।
পাতায় তো শিগির্ মিগির্
করে বেহুলা।

(৬)
একঅ দিনকার হলুদ বাঁটা,
ওলো ও সই তিনদিনকার বাসি।
মায়ে বাপকে বঅলে দিঅ,
বড়ই সুখে আছি।।

জাওয়া গান গাওয়ার ভঙ্গিমা

এই গানের শব্দগুলো আলংকারিক ও রঞ্জিত করে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে প্রথম গানটিতে জাওয়া-ডালিতে রাখা একটি শস্যবীজ 'ধান' এবং দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম গানগুলোতে যথাক্রমে 'মুগ', 'ছোলা', 'মটর', 'জনহার বা ভুট্টা' বীজের কথার উল্লেখ আছে। এইভাবে সমস্ত শস্যবীজের কথা এই গানগুলির মাধ্যমে তুলে ধরা হয় এবং তাদের দ্রুত বেড়ে ওঠার আনন্দ প্রকাশ করা হয়। আবার ষষ্ঠ গানটিতে বোঝানো হয়েছে সদ্যবিবাহিতা রমণীরা আসন্ন করম পরবে বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য পথ চেয়ে বসে আসে। কখন তাদের মা, বাবা বা দাদা আসবে তাদের নিয়ে যেতে। তাদের করম সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার তারা একসঙ্গে করম পরব পালন করবে। এক দিনের হলুদ বাঁটা মসলা তিন দিনের বাসি হয়ে গেলেও কাজ চালাতে হয়। কিন্তু এই দৈন অবস্থার কথা তাদের বুকে চেপে রেখেও বলতে হচ্ছে তারা খুবই ভালো আছে। এই জাওয়া গান কোথাও লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না। বংশ পরম্পরায় পূর্ব পুরুষদের মুখে শুনে আসা গানগুলিই এই উৎসবে গাওয়া হয়। এর কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন বিভিন্ন ভাবে গানগুলি পরিবেশন করে। এইভাবে শুক্লা একাদশী তিথির পূর্ব দিন পর্যন্ত জাওয়া-ডালিগুলো পরিচর্যা করে চারাগাছগুলোকে পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা হয়। এটাই ছিল জাওয়া পাতার চিরাচরিত স্বরূপ। তবে কয়েকটি প্রত্যন্ত গ্রামীণ ক্ষেত্র ছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চিত্র খুবই বিরল। পদ্ধতি মেনে জাওয়া-ডালিগুলো এখন যে যার বাড়িতেই পাতে এবং পরিচর্যা করে চারাগাছগুলো বড় করে তোলে। সকাল সন্ধ্যা দলবদ্ধভাবে গান ও নাচ করার রীতি বহু ক্ষেত্রেই বিলুপ্ত হতে চলেছে। কেবলমাত্র শুক্লা একাদশীতে করমপূজার সময় সন্ধ্যেবেলা কুমারী মেয়েরা তাদের নিজ নিজ জাওয়া-ডালিগুলো করম বেদীতে সাজিয়ে রাখে। আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামীণ এলাকাগুলোতে এখনও কুমারী মেয়েরা দলবদ্ধভাবে গান গাইতে গাইতে জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং করম পূজায় ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী- ফুল, ফল, পাতা ইত্যাদি বনজ উপাদান সংগ্রহ করে। এরপর সন্ধ্যেবেলা বাদ্যযন্ত্র সহকারে করম গাছের নিকটে গিয়ে একটি বা দুটি ডাল কাটার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। তারপর রীতি মেনে ডালটিকে বরণ করে নেওয়া হয়।

পাহান দ্বারা করম গাছের ডাল সংগ্রহ

একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে করম ডালটি বহন করে আনা হয় এবং সকলে সমবেত কণ্ঠে গাইতে থাকে-

"করম রাজা আসে তো হাতি চড়িয়ে,
করম রানি আসে তো ঘোড়ায় চড়িয়ে।
আজ রে করম রাজা ঘরে দুয়ারে,
কাল রে করম রাজা শাঁক নদীর পাড়ে।
আজ রে করম রানি ঘরে দুয়ারে,
কাল রে করম রানি শাঁক নদীর পাড়ে" ।

করম ডাল বহন করে আনার শোভাযাত্রা

পাহান দ্বারা করম ডাল বহন

কুমারী মেয়েদের দ্বারা করম ডাল বহন

যে সব গ্রামাঞ্চলে দুটি করম ডাল সংগ্রহ করার রীতি আছে, সেখানে একটি ডালকে করম রাজা এবং অপরটিকে করম রানির সঙ্গে তুলনা করে এই গানটি গাওয়া হয়। আবার যেখানে একটি মাত্র করম ডাল সংগ্রহ করা হয়, সেখানে শুধু করম রাজাকে উদ্দেশ্য করে গানটি গাওয়া হয়। এই গানের কথায় 'শাঁক' নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে শাঁক নদীর কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে এটি পার্শ্ববর্তী ঝাড়খন্ড রাজ্যের ঘাটশিলা এলাকার সুবর্ণরেখা নদীর একটি উপনদী। এই করম ডাল বহন করার প্রথা বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোথাও করম ঠাকুরের পূজারী- পাহান বা লায়া এই করম ডাল বহন করে আনে। আবার কোনো কোনো এলাকায় কেবলমাত্র কুমারী মেয়েরাই গান ও নাচ করতে করতে এই করম ডাল বহন করে আনে। আবার কোনো স্থানে যুবক ও যুবতী একত্রে এই করম ডালগুলো বহন করে আনে। তবে সবক্ষেত্রেই ঢাক, ঢোল, ধমসা, মাদল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান ও নাচের মাধ্যমে এই ডাল আনার পর্বটি সম্পন্ন করা হয়। এই করম ডাল করম বেদীতে প্রোথিত করার পর সারাদিন নির্জলা উপবাসে থাকা কুমারী মেয়েরা তাদের জাওয়া-ডালি সহ অন্যান্য পূজার সামগ্রী এনে বেদীর চারপাশে সাজিয়ে রাখে। উপবাসে থাকা এই কিশোরীদের কুড়মালী ভাষায় 'বারতি' বলে। তবে প্রত্যেক বারতির পূজার

সামগ্রীর সঙ্গে সিঁদুর মাখানো একটি কচি কাঁকুড় বা শশা থাকে। এই শশাগুলোকে তাদের সন্তানের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

করম বেদী

করম বেদীতে করম ডাল প্রোথিত করা হচ্ছে

জাওয়া- মায়েরা তাদের জাওয়া-ডালিগুলো করম ঠাকুরকে উৎসর্গ করে এবং বলে -

'আমার করম - আমার ধরম'

এর অর্থ ভাইদের মঙ্গল কামনায় কিশোরীরা করম রাজার কাছে এই প্রার্থনা করে। শুধু শস্য উৎপাদন ও রক্ষার জন্য নয়- পল্লীর মেয়েরা ভায়েদের মঙ্গলের জন্য করম পূজায় ব্রতী হয়, এই বিষয় জানা যায় করম গানের কয়েকটির মধ্যে। আরও লক্ষ্য করা যায়, এ অনুষ্ঠানে ভাই বলতে শুধু সহোদর বা নিজের পরিবারে ভাই নয়- কিশোরীরা পল্লীর কিশোরদের সকলকেই ভাই মনে করে, তাদের মঙ্গল কামনা করে করম ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানায়। এমন সুন্দর ও ব্যাপকভাবে (গ্রামগত) ভায়েদের মঙ্গলের জন্য পূজা অন্যত্র কোথাও কোন দেশে পল্লীর বোনেরা করে কিনা সন্দেহ (বাংলার লৌকিক দেবতা- গোপালকৃষ্ণ বসু, পৃষ্ঠা-১৪৩-১৪৪)। গ্রাম বা পাড়ার সকল বারতি উপস্থিত হলে গ্রামপতি এবং পাহান বা লাহা ও তাঁর সহকারীকে নিয়ে পূজা আরম্ভ করেন। কুড়মি সম্প্রদায় পুরোহিতকে 'পাহান' এবং সাঁওতাল সম্প্রদায় পুরোহিত বা পূজারীকে 'লাহা' বলে থাকেন। এই পূজা যেহেতু কোনো ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন হয় না, তাই এই পূজায় বিশেষ কোনো মন্ত্র উচ্চারিত হয় না বললেই চলে। পাহান বা লায়া তাঁদের নিজস্ব রীতি মেনে করম দেবতার কাছে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও অপদেবতার হাত থেকে ফসল রক্ষার প্রার্থানা জানায়। এই পূজা চলাকালিন গ্রামপতি বা কোনো অভিজ্ঞ ব্যাক্তি বা কথক একটি কাহিনি বলা শুরু করেন। কুড়মি সম্প্রদায় এই কাহিনিকে 'করম-কহ্নি' বলে থাকেন। এই কাহিনি বা কহ্নি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ তাঁদের নিজস্ব ভাষায়ও ব্যক্ত করে থাকেন। তবে কাহিনির মূল বিষয় একই থাকে। এই করম কাহিনি করম পরবেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

পাহান কর্তৃক করম পূজা

কারণ এই কাহিনির মাধ্যমেই করম পূজার প্রাচীন ইতিহাস বা প্রচলন সম্পর্কে কিশোর কিশোরীদের জ্ঞাত করানো হয়। গ্রাম বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি এই পূজায় পাঠ করে শোনা যায়। এই কাহিনি কথক মশায় খুব মনযোগ সহকারে বারতিদের শ্রবণ করতে নির্দেশ দেন। শুধু শুনলেই চলবে না, কথক মহাশয়ের কথার পরিপ্রেক্ষিতে সকল শ্রোতা ও বারতিদের সমর্থন জানিয়ে 'হ্যাঁ' বা 'হুঁ' এই শব্দ দুটি সজোরে উচ্চারণ করতে বলা হয় এবং তাঁর নির্দেশ মত বিভিন্ন পূজার সামগ্রী করম ঠাকুরের কাহিনি বলার মাঝে মাঝেই বেদীতে প্রোথিত করম ডালটির দিকে বারতিদের নিক্ষেপ করতে বলা হয়। সারাদিন নির্জলা উপবাসে থাকার পর বারতিরা কেউ কেউ ঘুমিয়ে বা ঝিমিয়ে পড়তে পারে, তাই তাদের সজাগ রাখার জন্যই 'হুঁ' শব্দটি সজোরে উচ্চারণ করতে বলা হয়। কাহিনিটি চলাকালীন বারতিদের আত্মীয় পরিজন বারতিদের পেছনে পেছনে চারদিকে ঘুরতে থাকেন। কোনো বারতি অন্যমনস্ক থাকলেই সুযোগ বুঝে নিছক মজা করার জন্য বারতিদের থালায় থাকা শশাটি যা তাদের সন্তান হিসেবে গণ্য করা হয়, তুলে লুকিয়ে রাখেন। পরে আবার সেটি ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পূজার শেষে শশাটি বাড়িতে রাখার তিন দিন পর বারতিদের মা-বাবা, কাকা-কাকিমা, জ্যাঠা-জ্যাঠিমা, পিসি-পিসিমা ইত্যাদি সম্পর্কিত ব্যাক্তিরা ঐ শশাটি কেটে ভাগ করে খান।

গ্রাম বাংলায় করম পূজার সময় কয়েকটি গল্পকথার উপস্থাপনা করা হয়, যা এই পরবের অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ হিসেবে ধরা হয়। একে 'করম-কাহিনি' বলে। কুড়মি সম্প্রদায় আবার একে 'করম-কহ্নি' বলে। এই কাহিনিগুলো বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও আঙ্গীকে পরিবেশণ করা হয়।

কথক কর্তৃক করম কাহিনি পাঠ

করম কাহিনি শ্রবণে মগ্ন বারতি

এই কাহিনিগুলোর মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি কাহিনি হল 'করমু ও ধরমু'র কাহিনি। কুড়মি সমাজে প্রচলিত লোককথা অনুযায়ী জানা যায়, বহু প্রাচীন কালে কোনো এক সময় এক কুড়মি রাজা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিল এবং অত্যধিক গরমের কারণে গাছটির একটি ডাল ভেঙে হাওয়া করছিল। কিন্তু যে ডালটি ভেঙে ছিল সেটি ছিল একটি করম গাছের ডাল এবং ঐ ডালেই ভ্রমর-ভ্রমরি বাসা বেঁধেছিল। ডালটি ভাঙার ফলে তাদের বাসাটিও ভেঙে যায়। ক্রুদ্ধ হয়ে তারা রাজাকে অভিশাপ দেয় যে তার কোনো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না। রাজা নিঃসন্তান ছিল, তাই ভ্রমর-ভ্রমরির কাছে কাকুতি করে তাকে শাপমোচন করার অনুরোধ জানায়। রাজার কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তারা রাজাকে বলে, ঐ ভাঙা ডালটি নিয়ে নিজের ঘরে স্থাপন করে সারাদিন নির্জলা উপবাসে থেকে পূজা করলেই রাজা শাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং এর ফলে তার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিবে। এই কথায় রাজা রাজি হয়ে জঙ্গল' থেকে বাড়িতে ফিরে আসে এবং ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর দিন নিজের ঘরের উঠানে ঐ ভাঙা করম ডালটি প্রোথিত করে পূজা শুরু করে। পাড়ার ও পাশাপাশি গ্রামের বহু মানুষ একত্রিত হয়ে এই পূজায় সামিল হয়, ফলে এটি পরবের আকার ধারণ করে। সারারাত বাদ্যযন্ত্র সহ নাচ গান চলে। এর পর ঐ রাজার ঘরে 'করমু' ও 'ধরমু' নামক দুটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার পর থেকে রাজার পরিবারে সুখ সমৃদ্ধি, ধন সম্পদ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজার মৃত্যু কালে দুই পুত্রকে ডেকে রাজা উপদেশ দেয় তারা যেন প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর দিন মহা ধুমধামে বাদ্যযন্ত্র সহকারে সারাদিন নির্জলা উপবাসে থেকে করম ডাল এনে করম ঠাকুরের পূজা করে এবং পরের দিন কচু পাতায় নুন ছাড়া বাসি ভাতের পান্না ও তেল, নুন ছাড়া সবজির বাসি তরকারি খেয়ে ব্রত ভাঙে। পিতার নির্দেশ মত দুই পুত্র প্রতি বছর সেইভাবেই করম পরব পালন করে। কিন্তু একবার এর ছন্দ পতন ঘটল। ধরমু সঠিক নিয়মে বাসি ভাতের পান্না খেয়ে করম ব্রত ভঙ্গ করল। কিন্তু করমু গরম ভাতের পান্না কচু পাতায় ঢেলে খাওয়ার আয়োজন করল। এর ফলে করম ঠাকুরের গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। রাগে যন্ত্রনায় ছট্‌পট্ করতে করতে করম ঠাকুর সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চলে গেল। সেই দিন থেকে করমুর 'করম কপাল বাম' হল অর্থাৎ তার সংসারে চরম দুর্দশা নেমে এল। সংসারের অভাব অনটন দূর করতে করমু ও তার স্ত্রী তার ভাই ধরমুর জমিতে চাষের কাজ করতে গেল। দুপুর বেলা ধরমু চাষের কাজে নিযুক্ত সকল শ্রমিককে খাবার পরিবেশন করার পর যখন তার ভাই করমু ও তার ভাতৃবধুর কাছে পৌঁছাল, তখন দেখল যে, খাবার শেষ হয়ে গেছে। করমু ভাবল ধরমু হয়তো পরে আবার তাদের জন্য খাবার নিয়ে আসবে। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেলেও ধরমু তাদের জন্য পুনরায় খাবার নিয়ে ফিরে এল না। ফলে সেদিন বহু কষ্টে তদের অন্ন না খেয়েই রাত কাটাতে হল। আবার একদিন ধরমু ঘর থেকে সকলকে বীজ ধান বিতরণ করছিল জমিতে বপন করার জন্য। কিন্তু করমু ও তার স্ত্রী যখন ধরমুর কাছে বীজ ধান নিতে গেল। তখন ধান শেষ হয়ে গেল, তার ভাগ্যে আর জুটল না। এতে করমু রেগে গিয়ে একদিন রাতে ধরমুর ধান ক্ষেতের পাড় ভাঙতে ও ধানের শিঁস কাটতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণই দেখে যে, ক্ষেতের পাড় বা আল এবং ধানের শিঁস পূর্বের ন্যায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। সে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ধরমুর যা যা ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে, সে প্রতি ক্ষেত্রেই বার বার বিফল হয়েছে এবং ধরমুর দিনের পর দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।

একদিন করমু দিশেহারা হয়ে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল। এমন সময় আকাশে চাঁদ উদয় হল। করমু চাঁদের কাছে তার দুঃখের কাহিনি শুনিয়ে এর থেকে মুক্তির পথ জানতে চাইল। তখন চাঁদ করমুকে জানায় যে, সে গরম ভাতের পান্না দিয়ে ব্রত ভঙ্গ করেছিল বলে করম ঠাকুরের গায়ে ফোস্কা পড়েছে এবং এর ফলে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ঠাকুর সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চলে গিয়েছে। তার পর থেকেই তার জীবনে এই চরম দুর্দশা নেমে এসেছে। এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় সে যদি করম ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করে আসতে পারে, তবেই তার দুঃখ দুর্দশা ঘুছবে। এই কথা শুনার পর করমু তার স্ত্রীকে ঘরে রেখে একাকী সাত সমুদ্র তের নদীর পারে করম ঠাকুরের নিকট যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সারাদিন বহু পথ পরিক্রমা করার পর প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে একটি পুকুরের কাছে গেল তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। কিন্তু দুহাতের তালু দিয়ে জল তুলতেই দেখল জলে পোকা কিল্‌বিল্ করছে। তাই জল পান না করেই করমু আবার পথ চলতে শুরু করল। পুকুরটি করমুকে তার গন্তব্যের কথা জিজ্ঞেস করলে করমু উত্তর দেয়, তার করম কপাল বাম হয়েছে, তাই সে করম ঠাকুরের কাছে যাচ্ছে এর সমাধানের উপায় জানার জন্য। তখন করমুকে পুকুরটি বলে, সে যেন করম ঠাকুরের কাছে তার এই অবস্থার কথাটি জানায়, কেন তার জলে এত পোকা

হয়েছে। করমু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় এবং আবার হাঁটতে শুরু করে। এইভাবে পর পর একটি ডুমুর গাছের কাছে, মাথায় খড়ের বোঝা চাপানো বৃদ্ধার কাছে, গরু গোঠের কাছে, ঘোড়ার পালের কাছে ইত্যাদি যেখানে সে যে উদ্দেশ্যেই যায়, সব ক্ষেত্রেই তাকে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এর পর থেকে করমু আর কোথাও না থেমে নিরুপায় হয়ে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সম্মুখপানে হাঁটতেই থাকে। অবশেষে একটি বিশাল সমুদ্রের কাছে উপনীত হয়। সমুদ্র দেখে সে হতাশ হয়ে পড়ে, অনেক ভাবনা চিন্তা করে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার উপক্রম করে। এমন সময় একটি কুমিরকে সে দেখতে পায় তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কিন্তু কুমিরকে দেখে করমু দূরে পালাল না, সে ভাবল ক্ষিদায়, তৃষ্ণায় মরার চেয়ে কুমিরের পেটে যাওয়ায় ভালো। করমুর এই অবস্থা দেখে কুমির তার কারণ জিজ্ঞেশ করে। করমুর দুঃখের কাহিনি শুনে কুমির তাকে সমুদ্র পার করে দেবার ভরসা দেয়। বিনিময়ে করমু যেন করম ঠাকুরকে তার এই সমস্যার বিষয়টি জানায়, কেন সে ডুব দিতে পারে না এবং কেন তাকে সব সময় জলে ভেসে থাকতে হয়। করমু এতে সম্মতি জানালে কুমির তাকে পিঠে চাপিয়ে সমুদ্র পারাপার করে দেয়। কুমিরের পিঠ থেকে নেমে করমু ছুটতে ছুটতে একটি ঝর্ণার কাছে পৌঁছে দেখে এক অতীব সুদর্শন পুরুষ ঝর্ণার জলে ডুবছে আর উঠছে এবং তাঁর শরীর থেকে উজ্জ্বল আলোর ছটা চারদিকে ছিট্‌কে পড়ছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে করমু বুঝতে পারে, ইনি সেই করম ঠাকুর। ছুটে গিয়ে করমু তাঁর পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, তার ভুল হয়ে গেছে আর কখনও গরম ভাতে পান্না করবে না এবং এরপর থেকে করম পূজার সব নিয়ম-রীতি মেনে চলবে। করম ঠাকুর তখন দেখল এমনিতেই করমু অনেক কষ্ট পেয়েছে, তারপর করমুর স্পর্শে তাঁর শরীরের জ্বালা যন্ত্রনাও মিটে গেছে, তাই করমুকে সে ক্ষমা করে দেয়। এরপর করমু রাস্তায় ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার কথা ঠাকুরকে জানায়। ঠাকুর সব কথা শুনে সবার মুক্তির উপায় করমুকে বলে দেন।

এর পর করম ঠাকুরকে ভক্তিসহকারে প্রণাম নিবেদন করে করমু বাড়ি ফিরে আসার জন্য পথ চলা শুরু করে। চলতে চলতে যখন সমুদ্রের কাছে পৌঁছায়, তখন দেখে কুমিরটি তার পথ চেয়ে বসে আছে। কুমিরটি জানতে চায়, তার মুক্তির উপায় হিসেবে করম ঠাকুর কী বলেছেন। করমু ভেবে দেখল এই মূহূর্তে বলে দিলে সে তো ডুবে যাবে এবং তাকে খেয়ে নিতেও পারে। তাই সে বুদ্ধি খাটিয়ে বলে সমুদ্র পার হয়ে যাওয়ার পর কুমিরকে তার মুক্তির উপায় বলবে। কুমিরের পিঠ থেকে নেমে করমু তাকে বলে, সে অনেক নিরীহ মানুষকে খেয়েছে। তার মধ্যে অনেক মহিলাও ছিল। তাদের গয়নাগাটি সব তার পেটে জমা হয়ে আছে। সেইসব যদি কোনো গরীব-দুঃখী ব্যাক্তিকে সে দান করে দেয়, তাহলেই সে মুক্তি পাবে। সেই কথা শুনে কুমির বলে কোথায় সে গরীব-দুঃখী খুঁজতে যাবে, তাই সে করমুকেই সব কিছু নিয়ে যেতে বলে। কুমিরের কাছ থেকে সব গয়নাগাটি নিয়ে করমু চলতে চলতে ঘোড়ার পালের কাছে এসে পৌঁছায়। তাদের সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দিলে, প্রধান ঘোড়া সহ পালের সমস্ত ঘোড়া করমুর সঙ্গে চলতে শুরু করে (এই সময় করম কাহিনির কথক বারতিদের একটি মাটির ঘোড়া করম ঠাকুরকে নিবেদন করতে বলে)। এরপর করমু ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘোড়ার পাল সহ গয়নাগাটি নিয়ে মাথায় খড়ের বোঝা চাপানো বৃদ্ধার সমস্যা সমাধানের উপায় বলে (এই সময় বারতিদের ধানের ফুল বা শীষ নিবেদন করতে বলা হয়)। অনুরূপ ভাবে যাওয়ার পথে যার যার সমস্যার মুক্তির উপায় করম ঠাকুরের কাছে করমু জেনে ছিল, ফেরার পথে তাদের প্রত্যেকের সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় সে বলে দেয় (সেই অনুসারে বারতিদের যথাক্রমে দাঁতন কাঠি, আমলকি ফল বা পাতা, বেল, গরুর দুধ, জল ইত্যাদি করম ঠাকুরকে নিবেদন করতে বলা হয়) এবং বিনিময়ে সে তাদের কাছ থেকে প্রচুর সোনাদানা, মনিমানিক্য, ধনসম্পত্তি দান হিসেবে লাভ করে।

এরপর ঘোড়ার পাল, গরুর গোঠ, সোনাদানা, গয়নাগাটি, মনিমানিক্য, ধনসম্পত্তি সহ করমুকে দূর থেকে একটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাড়ির দিকে আসতে দেখে, ধরমু অবাক হয়ে করমুকে জিজ্ঞেস করে, কোথা থেকে, কিভাবে করমু এত কিছু পেয়েছে? করমু তার ভাই ধরমুকে জানায়, যা কিছু সে পেয়েছে; সবকিছুই করম ঠাকুরের কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে। এর পর থেকে করমু আর ধরমু দুই ভাই প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে করম ডাল প্রোথিত করে বাদ্যযন্ত্র সহকারে করম পরব পালন করে এবং পরদিন সকালে রীতি অনুসারে বাসি ভাতের পান্না খেয়ে করম ব্রত ভঙ্গ করে। কথকের কাহিনি বলা শেষ হলে বারতিরা বাকি সব ফুল, পাতা ইত্যাদি করম ঠাকুরকে অর্পন করে। এটাই ‘করমু আর ধরমু’র কাহিনি। তবে সমাজ ও এলাকা অনুযায়ী এই কাহিনির অনেক রূপান্তর হয়েছে।

করম-কাহিনি বলা শেষ হলেই করম পূজার পর্ব সমাপ্ত হয় এবং বারতিরা সকলে বাড়ি ফিরে যায়। কিছু মূহূর্ত পর ধমসা, মাদল ইত্যাদি বাজিয়ে করম বেদীর চারদিকে বাজনার তালে তালে গান ও নাচ চলে। এতে পুরুষ ও মহিলা সকলেই অংশগ্রহণ করে। এই নাচকে 'করম নাচ' বা 'পাতা নাচ' বলে। এই গানগুলোর মাধ্যেমে গ্রামীন জীবনের সমাজ চিত্র, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ভাই বোনের মধুর সম্পর্কের কথা, নারীর দুঃখ-দুর্দশার কথা বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠে।

করম নৃত্য বা পাতা নাছ

পরের দিন দ্বাদশীতে সকালবেলা সূর্যোদয়ের পর জাওয়া ডালাগুলো করম বেদী থেকে তুলে আবার গান করতে করতে পাশাপাশি কোনো নদী বা পুকুরে বিসর্জন দিতে যাওয়ার সময় সকলে মিলে বলে –

"যাঅ যাঅ করম রাজা ইঅ ছঅ মাস-
আনব করম রাজা ঘুরি ভাদর্ মাস"।

এই গানটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে কুড়মি সংস্কৃতিতে ১২০ দিনকে ১ মাস হিসেবে ধরে, তাই এই ভাদ্র মাসে করম রাজাকে বিদায় জানিয়ে ছয় মাস পর পুনরায় ভাদ্র মাসে তাঁকে ফিরিয়ে আনা অঙ্গীকার করা হয়।

জাওয়া-ডালি বিসর্জন

এর পর ফিরে এসে বাসি ভাতের পান্না খেয়ে সকলে করম ব্রত ভঙ্গ করে। গ্রাম বাংলার কৃষিজীবি মানুষেরা খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে দ্বাদশীতে জঙ্গল থেকে শাল গাছের ডাল কেটে এনে তাদের ধান ক্ষেতের মাঝে মাঝে পুঁতে দেয়, তাদের বিশ্বাস এতে ফসল দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং ফলন ভালো হবে।

উপসংহার:

আদিকালে অরণ্যচারী মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি নানা উপাদানের উপর দেবত্ব আরোপ করে ধর্ম-কর্ম, আনন্দ-উৎসব পালন করত। তার মধ্যে বৃক্ষপূজা অন্যতম। ঝাড়গ্রাম জেলার গ্রামীণ আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'করম' নামক বৃক্ষকে দেবতাজ্ঞানে পূজার মাধ্যমে পালিত হয় লৌকিক উৎসব'-করম পরব'।

করম পরব প্রসঙ্গে লেখক গোপালকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৪৬) বলেছেন, "করম পূজার অনুষ্ঠান ও কৃত্যগুলি লক্ষ্য করলে মনে হয় আদিম বা প্রাগ্‌বৈদিক যুগের কোন কোমের বা অন্যব্রতদের বৃক্ষপূজা ও উর্বরাশক্তি উপাসনার নিদর্শন আর বর্তমানে এঁর উৎসব মাঠ থেকে আউস ধান ঘরে আনার আনন্দ প্রকাশ ও কৃষি দেবতা করমের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন"। করম পরবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ- 'জাওয়া পাতা'র মধ্যে লুকিয়ে আছে সৃষ্টি ও সৃজনশীলতার ঈঙ্গিত। করম পরবে বৃক্ষপূজা কেবলমাত্র একটি পূজা নয়, এটি প্রকৃতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে। এই পরব বৃক্ষ রোপনে উৎসাহিত করে। এই উৎসব মানুষকে কর্মযোগী হওয়ার প্রেরণা দেয় ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেয়, যা বংশপরম্পরায় সামাজিক বন্ধন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে দৃঢ়তা প্রদান করে। এই পরব শুধুমাত্র ভালো ফসল উৎপাদন বা সমৃদ্ধির জন্যই উদ্‌যাপন করা হয় না, এর মাধ্যমে গ্রামীন বাংলার ভাইবোনের মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসা ও সহমর্মিতা গড়ে ওঠে, যা বর্তমানে খুবই জরুরী। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠান কোনো বিশেষ দেবদেবী, বা বিগ্রহকে কেন্দ্র করে পালিত হয়, কিন্তু করম পরব পালিত হয় বৃক্ষকে আবর্তিত করেই অর্থাৎ প্রকৃতিতে মানুষের প্রাণের বিশুদ্ধতার প্রতিককেই আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে পূজা করে এই পরব পালন করা হয়, এ এক অনন্য প্রথা।

গ্রাম বাংলার প্রাচীন পরিবেশবান্ধব লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবটি বর্তমান প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে পরিবেশ সচেতনা বৃদ্ধি করতে পারলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং সমগ্র প্রাণীকুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই উৎসবটির প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব বিচার করে আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই পরব পালনের জন্য ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর দিনটিতে সরকারি ছুটি থাকে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও করম পরব যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপনের জন্য এই দিনটিতে পূর্ণ দিবস ছুটি থাকে।

তথ্যসূত্র:

১। বসু, গোপালকৃষ্ণ। বাংলার লৌকিক দেবতা। অষ্টম সংস্করণ। আগস্ট, ২০২৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩
২। ঘোষ, বিনয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। দ্বিতীয় খণ্ড। জানুয়ারি, ২০২২, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬
৩। ঘোষ, নীহাররঞ্জন। বাংলার ইতিহাস-আদি পর্ব। ১৯৮০, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩
৪। দে, ডঃ মধুপ। ঝাড়গ্রাম-ইতিহাস ও সংস্কৃতি। জানুয়ারি ২০২০, মনফকিরা, ২২৮৩ নবোদিত, নয়াবাদ, ডাক মুকুন্দপুর, কলকাতা-৭০০০৯৯
৫। দে, ডঃ মধুপ। ঝাড়গ্রাম দর্পণ। ২০২৩, প্রকাশক- চন্দন দত্ত, ঝাড়গ্রাম
৬। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ঝাড়গ্রাম, ২০১৭
৭। লেখিকার ক্ষেত্র সমীক্ষা